

নজরুলের আখ্যানমূলক কবিতা

সফিকুল্লাহী সামাদী

নজরুলের আখ্যানমূলক কবিতার সংখ্যা কম। তবে এমন কিছু কবিতা আছে যাতে প্রচ্ছন্ন কাহিনীর আভাস আছে। এটা সর্বজনবিদিত, নজরুল স্থির চিন্তে কোন শিল্পচর্চা করেননি, কোন সময়ের স্থির-নির্জনতা তার সৃজনীসত্তার পরিসর রচনা করেনি। ভবঘুরে স্বভাবে নজরুল অসংযমের আরাধনা করেছেন। দ্বিধাহীন সত্য, তাঁর আবেগে কোন সংযম ছিল না। কিন্তু যে সময়ে, যে সমাজে নজরুল জনগ্রহণ করেছেন সেখানে জাতিত্বের দ্বন্দ্ব ও সাম্প্রদায়িক-উগ্রতায় উত্তপ্ত, সাম্রাজ্যবাদীর শোষণে অতিষ্ঠ বাংলার মানুষ। নজরুল বড়ো কবি। সমাজ সচেতন কবি। তাঁর কবিতা সমাজ ও রাজনীতিকে নিয়ে। প্রথর প্রতিবাদী একজন মানুষ সমাজের বাইরে থেকে কিছু করতে পারেন না। সামাজিক দায় থেকেই কাব্যচর্চা করেছেন তিনি। নজরুলের কবিতায় কাহিনীর সুস্পষ্ট প্রভাব খুব কম। মূর্ত কাহিনীর কবিতা হিসেবে চিহ্নিত করা যায় ‘অগ্নি-বীণা’ (১৯২২) কাব্যের “খেয়াপারের তরণী”, “মোহররম”, এবং ‘ঝিঙে ফুল’ (১৯২৬) কাব্যের কিছু শিশুতোষ কবিতা। তবে বিমূর্ত কাহিনীর বিধৃতায়ন আছে কিছু কবিতায়। কাহিনী নয় কাহিনীর ছায়া (Story Skech) আছে ধর্মীয় ও প্রেমমূলক কয়েকটি কবিতায়। ধর্মীয় চেতনামূলক বিমূর্ত কাহিনী কবিতার পর্বে “কামাল পাশা”, “আনোয়ার”, “শাত-ইল-আরব”, “খালেদ”, “চিরঞ্জীব জগলুল”, “ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম” (আবির্ভাব), “রীফ সর্দার” প্রভৃতি কবিতা। প্রেমমূলক বিমূর্ত কাহিনীর কবিতা “পূজারিণী”, “বাতায়ন-পাশে গুবাক-তরুর সারি”, “চেতী হাওয়া”, “শীতের সিদ্ধু”, “কর্ণফুলী”, “তুমি মোরে ভুলিয়াছ”, “আমার কবিতা তুমি” ইত্যাদি। নজরুলের মূর্ত ও বিমূর্ত কাহিনীর কবিতার বিভাজন দেখে স্বভাবতই এমন প্রশ্ন আসতে পারে নজরুল কেন ‘Story line’ পুরোপুরি রক্ষা করে বেশী কবিতা লেখেননি? এটা কি তার অসংযমী চেতনার ফল না-কি সম্প্রদায় ও সমাজের প্রতি অনিবার্য দায়িত্ব থেকে। কবিতার গঠন-কৌশল এবং এর বিষয়ালোচনায় এমন প্রশ্নগুলো খতিয়ে দেখা যেতে পারে। কেননা এটা নিশ্চিত, নজরুলের অসংযত চিন্তের সাথে জড়িয়ে আছে তার ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি-চেতনা। এ ক্ষেত্রে বারবার তার কবিতা কখনো কিংবদন্তী কখনো পৌরাণিক ধারণায় কখনো স্মৃতিতপর্গে আবিষ্ট থেকেছে। এ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই স্বধর্মের মানুষ এবং সমাজকে গৌরবোজ্জ্বল শৌর্য-বীর্যের কাহিনীর প্রতি সচেতন করে তুলেছেন। এক্ষেত্রে শিল্পচর্চার চেয়ে সামাজিক দায়িত্বই তার বেশী অগ্রাধিকার পেয়েছে।

পুরো আখ্যানমূলক কবিতা ‘খেয়া-পারের তরণী’। এখানকার কাহিনী স্পষ্ট। চমৎকার এক চিত্রকল্পে কাহিনীর আভাস নজরে পড়ে।

যাত্রীরা রাত্তিরে হ’তে এলো খেয়া পার,
বজ্রের তুর্থে এ গর্জেছে কি আবার?
প্রলয়ের আহবান ধ্বনিল কে বিষাগে?
ঝন্টা ও ঘন দেয়া ঝনিল রে ঈশানে।’

সাহিত্যিকী

‘জলধির ভৈরব গর্জন’ আর ‘প্রলয়ের ডঙ্কার তর্জনে’ও কেয়ামতের ভয়ঙ্কর রাত্রিতে কেউ ভয় পাচ্ছে না; কারণ এ তরণীর কান্ডারী আহমদ। চার খলিফা ‘দাঁড়ি’ এ তরণীর। পুণ্যের যাত্রীরা খুব সহজেই খেয়া পার হবে। সুস্পষ্ট, দ্বিধাহীন সুখদায়ক এ যাত্রীদের পরিণতি। নিষ্পাপ যাত্রীদের দেখে কবি বোধ করি উল্লসিত হয়েছেন। প্রচ্ছন্ন আশাবাদ ঝরে পড়ে কবিতায়। অমানিশার কাল দেখে পুণ্যের যাত্রীদের ভীতু হবার কিছু নেই। নিশ্চয়ই কবি অন্তর্নিহিত শক্তি জাগ্রত করার-চেষ্টা করেছেন। ছন্দোবদ্ধ পদে, মুসলিম পুরাণের গাঁথনিতে প্রতীকায়িত ব্যক্তনায় কবি আসলে মুসলিম জাতির প্রতি সাহস যোগাচ্ছেন, প্রেরণা দিচ্ছেন। পশ্চাৎপদ, চিত্তহীন, শঙ্কিত মুসলমানদের উদ্দীপ্ত করছেন। স্পষ্ট কাহিনীর আড়ালে মহানবী ও চার খলিফার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে কবি নিজের আধ্যাত্মিক বোধের দিকেও ইঙ্গিত করেছেন। একই প্রবণতার আরেকটি মূর্ত কাহিনী কবিতা “মোহররম”। ফোঁসাত কূলের কাহিনীর ছন্দায়িত রূপ দিয়েছেন কবি। মোহররমের কাহিনীর ইঙ্গিত করে বাংলার মুসলমানদের বলেছেন---

তাগ চাই, মার্সিয়া ক্রন্দন চাই না
উম্মীয কোরানের, হাতে তেগ্‌ আরবির,
দুনিয়াতে নত নয় মুসলিম কারো শির।^১

এমন সুস্পষ্ট কাহিনী রচনার কি উদ্দেশ্যে কবির? হাসান-হোসেন, সকিনা, জয়নাল এদের মর্মভ্রদ কাহিনী প্রচার নজরুলের কাছে কেন জরুরী? উত্তর কবি নিজেই দিচ্ছেন-‘জাগো, ওঠো মুসলিম, হাঁকো হায়দরি হাঁক’। পদানত নয় মুসলমান, ন্যূজ হয়ে থাকবার সময় নেই, এখনই শমশের হাতে নেমে পড়। কাহিনীর-প্রাণস্পর্শে গোটা মুসলিম জাতিকে স্মরণ করাচ্ছেন কারবালার কাহিনী। স্পষ্টভাবে উঠে আসছে শহীদানের স্মৃতিচিহ্ন। শৌর্য-বীর্যের ত্যাগের কাহিনী থাকা সত্ত্বেও মুসলমান কেন হীনান্যতায় ভুগবে! যে ঐতিহ্য তাদের সামনে দীপ্যমান, যে ছবি তাদের দিব্যদৃষ্টিভূল্য সেখানে কেন তারা পদানত? এসব প্রশ্নের আলোকে কবি জাগ্রত করেছেন মুসলিম জাতিকে। কবির মতে স্মৃতিচিহ্ন স্মরণ করে মাতমের সময় নেই। জেগে ওঠ স্পন্দনে, নেমে পড় যুদ্ধে। ঐতিহ্য ভিত্তিক কাহিনী বর্ণনার লেখকের একটাই উদ্দেশ্য অবিসম্মাদিত পরিচয়ে প্রেরণা লাভ এবং আত্মীয়তার সূত্র তৈরী করা।

নজরুলের বিমূর্ত কাহিনীর কবিতার মধ্যে “কামাল পাশা” অন্যতম। প্রচ্ছন্ন কাহিনীর আভাস লক্ষ্য করা যায় এতে। কামালকে সম্মোদন-পূর্বক কবি বলেছেন-

ঐ ক্ষেপেছে পাগলি মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই
অসুর-পুরে শোর উঠছে জোরসে সামাল কামাল ভাই

নজরুলের আখ্যানমূলক কবিতা

কামাল পাশা তুরস্কের জাতীয়বাদী আন্দোলনের নেতা। নজরুল তার বীরত্বের কাহিনী শোনাচ্ছেন, তাকে ডাক দিয়েই। ‘১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে আগস্ট তারিখে সাকারিয়া যুদ্ধে কামাল পাশার তুর্কী বাহিনী-চূড়ান্তভাবে গ্রীক বাহিনীকে পরাজিত করে, আর ঐ বছর অক্টোবর মাসেই নজরুলের ‘কামাল পাশা’ কবিতাটি প্রকাশিত হয়। এ কবিতাটি সমসাময়িককালের রাজনৈতিক ও সামরিক ইতিহাসের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কারণেই উল্লেখযোগ্য নয় সঙ্গে সঙ্গে বাংলা কবিতায় আধুনিক যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ব্যবহারের অভিনবত্বের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।’^{১০} নজরুল মুসলিম রাষ্ট্রের এক মুসলিম জাতীয়তাবাদী নেতার শৌর্য-বীর্যের কাহিনী শুনিye দামাল সন্তানদের সামনের দিকে অগ্রসর হবার প্রেরণা দিচ্ছেন। নজরুলের এমন সম্বোধিত স্বরে বীরপুঙ্গব কামালকে ডাক দেবার উদ্দেশ্য কি? কিংবদন্তীর কাহিনী শুনিye কাকে গৌরবান্বিত করছেন তিনি? একরকম প্রচ্ছন্ন কাহিনীতে গল্প বলে তিনি যে একসূত্রের বন্ধনে আবদ্ধ করছেন তার কারণ কি? “শাত-ইল-আরব” কিংবা “খালেদ”, “চিরঞ্জীব জগলুল” এসব কবিতায় কবির এমনভাবে আহ্বান জানানোর উদ্দেশ্য কি?

নিশ্চিতই নজরুল একটা সময়ের কথা বলছেন। যে সময়ে ভারতবর্ষে চলছে রাজনৈতিক উত্থান-পতনের পর্ব। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়িক ভেদে দ্বিধাশ্রিত। পশ্চাৎপদ মুসলমান মাত্র সজাগ হয়ে উঠেছে। উপনিবেশবাদী শক্তি ‘ভারত শাসন আইন’ করে তাঁদের শাসনকার্যের কলাকৌশল নির্ধারণ করছে। অনেক হত্যা, নমন, পীড়নে ছেয়ে গেছে দেশ। এপর্যায়ে গোটা অঞ্চল’র অস্থির, বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতিতে নজরুলের মতো কবি নিশ্চূপ থাকতে পারেন না। দেশ মুক্তির জন্য, স্বাধীনতার জন্য তার তৃষ্ণিত প্রাণ জেগে উঠেছে। সমাজের বৈষম্য, পরাধীনতার গ্লানি তাঁর চিত্তকে বারবার আন্দোলন সংগ্রামের পথে উসকে দিয়েছে। শুধু কোন বিশেষ জাতি বা গোষ্ঠীর জন্য নয়, বাঙালির সংগ্রামশীল মননকে ঐক্যসূত্রে বাঁধতে চেয়েছেন তিনি। এক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের মানুষের ঐতিহ্যের প্রতি, স্বাধীনতার প্রতি, কিংবদন্তীর নায়কদের শৌর্য-বীর্য গাঁথা প্রতি সমর্পিত করে জাগাতে চেয়েছেন। হিন্দুদের নিবন্ট মুসলমানের ঐতিহ্যগাঁথা পরিচিত করে তুলেছেন। পশ্চাৎপদ, হীনমন্য মুসলমানদের কিংবদন্তীর আভাসে পরিচিত কাহিনীকে সামনে তুলে ধরেছেন বিখ্যাত বীরদের সম্বোধনপূর্বক, কাহিনী শুনিye গৌরবগাঁথা প্রচার করছেন। ‘জিনজীর’ (১৯২৮) কাব্যের “খালেদ” কবিতায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে কবি যেন খালেদের কাহিনী খালেদকেই শোনাচ্ছেন-

খালেদ! খালেদ! ভাঙিবে না কি ও হাজার বছরী ঘুম?
মাজার ধরিয়া ফরিয়াদ করে বিশ্বের মজলুম!
শহীদ হয়েছে? ওফাত হয়েছে? ঝুটরাত! অলংবৎ
খালেদের জান কবজ করিবে ঐ মালেকুল-মৌৎ^{১১}

সাহিত্যিকী

বীরত্বগাঁথার কাহিনীকে পরিচিত করিয়ে মুসলমানরা নিজেরা যাতে গৌরব বোধ করে, অনুপ্রেরণা পায় সেজন্যই কবির এ আহবান গান। বারবার তিনি মুসলমানদের চেতনাকে নাড়া দিচ্ছেন কখনো শাত-ইল-আরবের কূলে কখনো ফোরাতে কূলে। আবার আনোয়ার, খালেদ, কামাল পাশা বা জগলুলের বীরত্বগাঁথা শুনিতে; এসব বীরত্বগাঁথার বয়ানে। নজরুল যে স্বতন্ত্র কৌশল বা টেকনিকের অবতারণা করেছেন সেটা নিশ্চয়ই আলোচনার দাবি রাখে। যে সম্মোহনী শক্তিতে কবি শাত-ইল-আরবের কূলে পৌঁছে যান, শাত-ইল-আরবকে ডাক দিয়ে তার সময় ও বীরত্বের কাহিনীর কথা বলেন, ঐতিহ্যের সূত্র ধরে মুসলমানকে পরিচয় করান তার অতীত ইতিবৃত্তের সাথে সেখানে কাহিনীর পুট তৈরী হয়না, কাহিনীর আভাসমাত্র একটা বিমূর্ত রূপে ধরা পড়ে। মুসলিম পুরাণ, জীবনগাঁথা, ইতিহাস এসব অন্তর্ব্যয়নের মধ্যে দিয়ে জাতিকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করেন কবি। এক্ষেত্রে সচেতন বিবেচনায় শিল্পমান নির্ধারণের চেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে স্বজাতির সচেতন বীরত্ব গাঁথা প্রচার। ভারতবর্ষের মুসলমানদের পরিচিত করা, তাদের প্রেরণা দেয়া সর্বোপরি ভিন্ন ধর্মের মানুষদেরও একটি জাতির ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় করানো। এমন উদ্দেশ্যেই বিমূর্ত কাহিনীর কবিতাগুলো লেখা হয়েছে। কাহিনীর জমাটবদ্ধ প্রয়াস নেই, নেই ঘটনার ঘনঘটা, অবহেলিত আনুপূর্বিক বিবরণ। কবি বোধ করি এসব দিকের কথা কখনই ভাবেননি বা প্রয়োজনও মনে করেননি। উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তেই তিনি বীর্যবন্তার প্রেরণাধর্মী এ কবিতাগুলো লেখেন। তবে শব্দ ব্যবহার ও ছন্দ-অলংকারের প্রয়োগে বিষয়ের যে দোষ্যতা তা শিল্পগুণসম্পন্ন। সংস্কারমুক্ত চেতনায় কবির পৌরাণিক শব্দ ব্যবহার এ পর্বের কবির কাব্যরীতিকে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে।

“কামাল পাশার” মতো “আনোয়ার” কবিতায় সংলাপ এবং গদ্য ভূমিকা উপসংহার অনেকটা নাটকীয় ঢং এনেছে কবিতায়। স্বধর্মের অবক্ষয়ে আর অধীনতায় ক্ষেদ এরকম-

ইসলামও ভুবে গেল, মুক্ত স্বদেশও নাই
তেগ ভাজি ধরিয়াছ ডিয়ারির বেশও তাই।^৫

তুরস্কের আনোয়ার পাশার কাহিনী-শোনাচ্ছেন প্রত্যক্ষভাবে আনোয়ার পাশাকে সম্বোধনপূর্বক। কিন্তু পরোক্ষভাবে গোটা মুসলিম সমাজের প্রতি তার এ উচ্চারণ। এক পরিচিত কাহিনী ও বীরত্বের পুনর্মূল্যায়ন করছেন কবি এমন আঙ্গিকে-

আনোয়ার! আনোয়ার!
দিলওয়ার তুমি, জোর-ডলওয়ার হানো, আর
নেস্ত-ও-নাবুদ কর, মারে যত জানোয়ার!^৬

নজরুলের আখ্যানমূলক কবিতা

কবিতার বিষয়ই গঠন-কৌশলই নির্দিষ্ট করে দেয়। নজরুলের কবিতায় বিষয় অনুষ্টি আঙ্গিক নির্মাণ বিশেষভাবে সত্য। আনোয়ারের বীরত্বগাঁথায় কবি উল্লসিত, তার উদ্দেশ্যে কবির যা-কিছু উচ্চারণ তা সম্মুখের বাঙালি মুসলমানের জন্য। উদাহরণ হিসেবে কিংবদন্তীর কাহিনীর প্রতি ইঙ্গিত করেন। শৃঙ্খলভাঙ্গার প্রেরণা কবি এভাবেই দিয়েছেন মুসলমানদের। কবির কাহিনীর আভাসে সৃষ্ট অন্য কবিতা “চিরঞ্জীব জগলুল” (১৯২৭)। কামাল পাশার মতো জগলুলও নজরুলের মনে রেখাপাত করেছিল। তবে লক্ষণীয়, নিছক কোন অবিসংবাদিত নেতার উচ্চারণ নয়, মুসলিম জাহানের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে কবির ধারণা ছিল স্পষ্ট। মিশরের সংগ্রামশীল সময়কে ধরতে গিয়ে মুসা ফোরাউন প্রসঙ্গ এসেছে। মুসলিম পুরাণের চমক আসে কবিতায়-

পয়গম্বর মুসার তব ত ছিল ‘আম্বা’ অতুত
খোদ সে খোদার প্রেরিত-ডাকিলে আসিত স্বর্গদূত
... ..
... ..
‘আদেশে তোমার নীল দরিয়ার বক্ষে জাগেনি পথ?
তোমারে দেখিয়া করেনি ছালাম কোনো গিরি-পর্বত।’

কেন পুরাণ? জাতিত্বের সচেতনতায় এবং বর্তমান সময়কে তার আলোকে গৌরবান্বিত করার কিংবা অন্য ধর্মের মানুষদেরও এ সম্পর্কে সচেতন করানো। “চিরঞ্জীব জগলুল” কবিতায় কাহিনীর আভাস ধরা পড়ে ইতিহাস ও পুরাণের আলোকে। এশিয়া-আফ্রিকার সংগ্রামী চেতনা ব্যাখ্যাত হয় মুসলিম ঐতিহ্যের প্রতিই ইঙ্গিত করে।

“ফাতেমা-ই-দোয়াজ-দহম” (আবির্ভাব) কবিতায় মুসলিম পুরাণের ভঙ্গিতে কাহিনীর আভাস নজরে আসে। আরব বিশ্বের অনেক উল্লেখযোগ্য স্থান, হেরা পর্বত, জিব্রাইল, ইস্রাফিল, কাবা-শরীফ ইত্যাদির প্রসঙ্গ এসেছে। নিছক ধর্মীয় আবেগ থেকে কবি এ কবিতা লিখেছেন। মহানবীর আদর্শ, সত্য ন্যায়ের প্রতীক হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠা, আধ্যাত্মিকতার বাইরে নজরুল স্বীয় ধারণা থেকেই উচ্ছ্বাসের জয়গান গেয়েছেন। তবে এটা সত্য, নবীর প্রতি শ্রদ্ধার পাশাপাশি একটা পারলৌকিক চিন্তাও তার মধ্যে কাজ করেছে। স্পষ্ট আখ্যান এ কবিতায় নেই, বিহীনভাবে পৌরাণিক শব্দ ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে বিমূর্ত কাহিনী ধরা যায়। মহামানবের আবির্ভাবে আরব বিশ্বের উৎফুল্ল হওয়া, আসমান-জমিন তার কীর্তনে মুখরিত। সুতরাং-মুসলমানদের আর ভয় নাই। এমন এক আদর্শকে সামনে রেখে বলেছেন মুসলমানদের বিচলিত হবার কিংবা সন্তুষ্ট হবার কিছু নেই। হয়তো অভয়বাণী শোনাবার জন্যই মহানবীর আবির্ভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে লিখেছেন-

‘সাবে ইন’
তাবে ইন্
হয়ে চিল্লায় জোর “ওই ওই নাবে দীন”।
ভয়ে তুমি চূমে ‘গাভ-মানাত’-এর ওয়ারেশীন
... ..
জেদার পূর্বে মক্কা মদিনা চৌদিকে পর্বত,
তারি মাঝে ‘কাবা’ আন্তার ঘর দুলে আজ হব ওঙ্ক^৮

সাহিত্যিকী

এ কবিতাটি নজরুলের একেবারে প্রথম দিকের রচনা। পৌরানিক শব্দের ব্যবহার তিনি করেছেন। আভাসিত কাহিনীতে গোটা আরব জাহানকে পরিচিত করে তুলেছেন কবি।

কবির 'সন্ধ্যা' কাব্যের "রীফ সর্দার" (১৯২৮) আখ্যানধর্মী কবিতা। মরক্কোর স্বাধীনতা সংগ্রামী রীফ উপজাতির নেতা আবদুল করিমকে উদ্দেশ্য করে এ কবিতাটি লিখেছেন। স্পেন ও ফ্রান্স সম্মুখযুদ্ধে হেরে বিশ্বাসঘাতকতার মধ্যে দিয়ে যে ঘৃণ্য চরিত্রের প্রকাশ ঘটায় তার বর্ণনা আছে কবিতায়। এজিদ, জয়নাল, আক্বাস উপমাধ্বরূপ কবিতায় এসেছে।

রীফ-সর্দারের বীরত্বের কথা ঘোষিত হয়েছে। আর হতভাগ্য মরক্কোবাসীর জন্য বলেছেন-

আজিকে জীবন 'ফেরাতে' তীর
এজিদ সেনা ঘিরিয়া ঐ
... ..
... ..
লুটে নিল ইউরোপ এজিদ ৷

আখ্যান নেই এ কবিতায়, তবে আখ্যানের ইঙ্গিত মেলে। শক্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার উচ্চারণ কবির। কখনো স্মৃতিচারণায়, কখনো রীফ বীরের প্রশংসায় উল্লাস কিংবা শ্রদ্ধা আছে কবিতায়। নজরুল প্রখর, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ছিলেন, শিকল ভাঙার গান গেয়েছেন বর্বরদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন-এক্ষেত্রে বেগন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মানুষ তিনি ছিলেন না। বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের যে কোন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং এ আন্দোলনের দৃষ্টাদের প্রতি অপরিসীম নিষ্ঠা ও সম্মান দেখিয়েছেন তিনি। জাতীয় বীরদের জয়ে সম্মান দেখিয়ে তাদের কাহিনী প্রচার করে স্বদেশীদের উদ্দীপ্ত করেছেন। ঐতিহ্য অনুসন্ধানে তার যে নিরলস তৎপরতা এর মূল কারণ স্বজাতির মানুষদের প্রেরণাদীপ্ত করা এবং তাদের চেতনার জাগরণ ঘটান। নজরুল ব্যাপকভাবে সেক্ষেত্রে সফল হয়েছেন, সন্দেহ নেই। ধর্মীয় চেতনামূলক মূর্ত আখ্যান ও বিমূর্ত আখ্যানের কিছু কবিতা দৃষ্টান্তস্বরূপ উপস্থাপন করে নজরুলের প্রবণতা চিহ্নিত করা গেল। আখ্যানমূলক বলতে মূর্ত ও বিমূর্ত দূরবর্মের কবিতাই (ধর্মীয়) এখানে আলোচনায় এসেছে। নজরুলের প্রেমমূলক বিমূর্ত কাহিনীর কিছু কবিতা এখন আলোচনা করা যেতে পারে।

নজরুলের আখ্যানমূলক কবিতা

‘দোলন চাঁপা’ (১৯২৩) কাব্যের “পূজারিনী” একটি বিমূর্ত আখ্যানমূলক কবিতা। প্রসঙ্গত বলা যায় ধর্মীয় কবিতাগুলোর মতো এখানেও মূর্ত ও বিমূর্ত দু’পর্বের আখ্যানমূলক কবিতা বিভাজন পর্বে মূর্ত কাহিনীর কবিতা স্বল্প নজরে আসে। ‘পূজারিনী’ কবিতায় কোন আখ্যান নেই। নিছক প্রেয়সীর প্রশংসা পর্বে যৌবনের স্মৃতিকথা, নষ্টালাজিক অতীত ব্যাখ্যা করেছেন কবি। এসব বিষয় ব্যাখ্যানের পর্বেই কবিতায় কিছুটা কাহিনীর আভাস লক্ষ্য করা যায়। প্রেমমূলক কবিতায় নজরুল নিছক ঝগা রোমান্টিক প্রেমের ওপর আবেগ ছড়িয়েছেন। প্রকৃতি ও প্রেমের বন্দনা আছে। সৌন্দর্য্যপিয়াসী নজরুল কখনো ব্যর্থ প্রেমের হাহাকার, কখনো পিয়াসী প্রাণে-প্রিয়াকে কাছে পাবার আকাঙ্ক্ষা, কখনো সমর্পিত প্রাণে নিবেদন জানানোর আবুতি বর্ণনা করেছেন। অসমমাত্রিক অক্ষরবৃত্তে লেখা এ কবিতায় প্রেমিকাকে পূজারিনীর পবিত্র মূর্তিতে উদ্ভাসিত করেছেন। আঁখি, মুখ, ভুরু, ললাট ও চিবুকের বিবরণ আছে। প্রিয়ার জন্য উন্মুখ হয়েছেন কবি। বিবরণধর্মী এ কবিতায় তার প্রিয়া কখনো বনের তাপস কুমারী শকুন্তলা, কখনো বিরহী রাধা বা ললিতা, দময়ন্তী। কাহিনীর আভাস মেলে যখন নানা বিশেষণে প্রিয়াকে ডেকে স্মৃতি রোমন্থনে বসেন কবি। দীর্ঘ প্রেমের কবিতা পূজারিনীতে কোন দৃশ্যপট নেই, নেই কোন ঘটনার উত্থান-পতন। কাহিনীর আভাস জমাটবদ্ধ হতে না হতেই মিলিয়ে যায়। স্কেচধর্মী অবয়ব হলেও আত্মকথনে কখনো তিনি নারীকে বিলাসী প্রেমের সারথী করেছেন কখনো খেদোক্তি করে বলেছেন-

ইহাদের অতিলোভী মন
একজনে তৃপ্ত নয়, এক পেয়ে সুখী নয়
যাচে বহুজন।^{১০}

নজরুলের প্রেমের প্রধান বিশিষ্ট্য দেহজ আবেগের কিংবা শরীরীকূপের রক্তিম পরিচর্যা। তার কবিতায় প্রেমিক যৌবনের জ্বালায় বিদ্ধ, প্রেমিকাকে কাছে পাওয়া বাসনায় সারাক্ষণ বেদনা বিলাসে আক্রান্ত। ব্যথিত প্রেমিক হতাশায়, অচরিতার্থতায় গুমরে মরে। এ অতৃপ্তির যন্ত্রনা মূর্ত কিংবা বিমূর্ত অবভাসে চিত্রকল্পে উঠে আসে-

ঝর বক্ষ টুটে-
মন-প্রাণ পুটে
কোথা হতে কেন এই মৃগ-মদ-গন্ধ-ব্যথা আসে।

“পূজারিনী” কবিতায় একান্ত অর্থে কোন বিষয় নেই। নিছক নিজের মনের আবুতিই ব্যক্ত করেছেন। যাযাবর, ভবঘুরে পথিক প্রেমিক ‘সাধু-লোভী বান-বেঁধা পাখি’-নিরবধি স্মৃতিচারণ করে যায় গোটা কবিতা জুড়ে। শেষ পঙ্ক্তিতে কবি বলেন-

তব প্রেমে মৃত্যুঞ্জয়ী
ব্যথা বিধে নীলকন্ঠ ছবি।

সাহিত্যিকী

কোন প্রবণতা থেকে কবি এমন কবিতা রচনা করেন? প্রেমিক সত্তার ফেনোচ্ছ্বাসই কি এর কারণ! নিশ্চয়ই অস্থির সময় কবিকে এক নির্জন নষ্টালজিয়ায় অবসর দিয়েছিল। প্রতিপার্শ্বিক সমস্ত হাহাকার, দামামা থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন। একজন জীবনবাদী কবি হিসেবে নজরুল নিশ্চয়ই একমুখী কোন জীবন চাননি। শরীরী প্রেম, সুন্দরীর প্রতি কামনা, ভালোলাগা তার প্রেমিক চিত্তকে অবসর দেয়নি। সমাজের শত দায়িত্ব, অসাম্যের-শোষণ কাঠামোর প্রতি ক্ষোভ তার যতই থাক, সবকিছু ছাড়িয়ে প্রেম তার বড়ো হয়ে উঠেছিল। এ প্রেমের প্রকৃতি অন্য রকমের নারীর প্রতি। পূজারিণীর প্রতি, হারিয়ে যাওয়া প্রেমিকার প্রতি। কবি বিবরণই দিয়ে গেছেন কিন্তু স্পষ্ট কাহিনীর অবয়বে- Story line- এ ধরতে পারেননি। ‘চক্রবাক’ (১৯২৯) কাব্যের “বাতায়ন-পাশে গুবাক তরুর সারি” আখ্যানধর্মী কবিতা। কবিতার শুরুতে কবির উচ্ছ্বাস ঝরে পড়ে। আন্তর্ভেদনায় কাহিনী জমাট বাধে। গুবাক পত্রে, শাখায়, দেহে কবি কিশোর প্রেমিককে দেখেছেন। বিদায়লগ্নে তার কথা মনে পড়ছে-কবি বলছেন ‘তোমারে লইয়া সৃজিব না ঘর সৃজিব অমরাবতী’। উচ্ছ্বাসে উচ্চারণ করে লেখেন-

তোমার পাতায় লিখিলাম আমি প্রথম প্রণয়-লেখা
এইটুকু হোক সান্ত্বনা মোর, হোক বা না হোক দেখা।”

আখ্যানধর্মিতার আড়ালে কবির ব্যক্তিগত আকৃতি বেশী প্রশ্নই পেয়েছে। গুবাক তরুর প্রতীকায়নে যে কিশোরীকে দেখেছেন সে কাছে নেই, বিদায় বেলা কাছে পাওয়াও যাবে না। সে হয়তো কবিকে মনে রাখেনি কিন্তু কবি তাকে মনে রেখেছেন। এবং দূরে গেলেও মনে থাকবে। কবি প্রেম যার জন্য সারাজীবন গন্ধবিধুর ধূপ পোড়াবে। তিনি পুড়িয়েই গন্ধ বিলাবেন।

‘ছায়ানট’ (১৯২৫) কাব্যের “চৈতী হাওয়া” বিমূর্ত আখ্যানের একটি প্রেমের কবিতা। এ কবিতায় কবি চৈত্র রজনীর স্মৃতিকে নিজের ভাবব্যান্জনায় বর্ণনা করেছেন। হৃদয়ের ব্যথা বেদনা আর স্মৃতি-কথা উঠে আসে কাহিনীর আভাসে। অবাঙমানসগোচর অনুভূতিতে কবি বলেন-

গুণ্য ছিল নিতল দিঘীর শীতল কালো জল,
কেন তুমি ফুটলে সেখা ব্যথার নীলোৎপল?
আধার দিঘীর রাঙলে মুখ
নিটোল ঢেউ-এর ভাঙলে বুক”

প্রকৃতির উপমার মধ্যে দিয়ে স্পর্শ-স্বাদকে শান্ত আবেগে প্রকাশ করেছেন। স্মৃতিকাতর মন এ কবিতায় এক দৃশ্যপট রচনা করে কিন্তু বিষয়ান্তর নেই। বারবার পুনরাবৃত্তি ঘটে ‘চৈতী রাতের স্মৃতির’। প্রিয়াকে পাওয়ার আশাবাদ যেমন আছে তেমনি তাকে নিয়ে নানা কল্পনার সৌধও রচনা করেন কবি। এগুলো কবির প্রেমিক মনে আকৃতি ও স্মৃতিচারণ। কাহিনীর আভাস যেটুকু এসেছে নিছক নষ্টালজিয়া স্মৃতিকে কেন্দ্র করে।

নজরুলের আখ্যানমূলক কবিতা

‘চক্রবাক্য’র “শীতের সিঙ্ক” কবিতায় প্রচ্ছন্ন আখ্যানের সাক্ষাৎ মেলে। কবিতাটি বেদনার জয়গানে মুখর। অসীমের পথে ছুটে চলা আকাক্ষার হাহাকার, না পাওয়ার বেদনা “শীতের সিঙ্ক” কবিতার মূল কথা। চট্টগ্রামের প্রকৃতির অভিজ্ঞতা, ঋতু বৈচিত্রের যে চিত্র কবি দেখেছেন তাই কাব্যে রূপ দিয়েছেন। বর্ষায় সিন্দুর অশান্ত রূপের পরিবর্তন হয়ে শীতের সিঙ্কর যে শান্তরূপ তাই কবি প্রত্যক্ষ করে অভিব্যক্ত হয়ে পড়েন। চিত্রকল্পের আধারে কবির ব্যাখ্যা-

তোমার কলঙ্কী বঁধু চাঁদ ডুবে যায়
তেমনি উঠিয়া দূর গগণ-সীমায়
ছায়া এসে পড়ে তার তোমার মুকুরে
ছায়াহীন, মায়াবীর মায়া বুকে পড়ে।^{১০}

এ সমস্ত কবিতায় উপমা-উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগে এক দৃশ্যচিত্র অংকিত হয়। বিষয়বস্তু এখানে ছন্দোবদ্ধ রূপ দিয়ে তার কবি ভাবনাকে প্রকাশ করেছেন। হৃদয়ের ফেনোচ্ছ্বাস কবির কবিতায় একটু কাহিনীর আভাস আনলেও তা তাৎক্ষণিক। এ রকমের অনেক প্রেমের কবিতাতে কবির সংযমহীন আবেগের প্রকাশ ঘটেছে। “তুমি মোরে ভুলিয়াছ”, “আমার কবিতা তুমি”-এসবে আখ্যানের আভাস থাকলেও নিছক কাঁচা প্রেমের কাহিনী। স্মৃতিচারণ, প্রেমসীর প্রশংসাবাদী মূল প্রসঙ্গ।

‘ঝিঙে ফুল’ কাব্যের কিছু শিশুতোষ কবিতায় সুস্পষ্ট কাহিনীর আভাস আছে। “লিচু চোর”, “ঠ্যাং ফুলি”, “খোকার বুদ্ধি”, “খোকার গল্প বলা”, “চিঠি”-এসব আখ্যান ধর্মী কবিতায় নজরুল দ্রুত লয়ের ছন্দে হাস্যরসের উদ্বেক করেছেন। শিশু উপযোগী মনোহর ভাষা প্রয়োগ করেছেন কবি। একমাত্র শিশুদের নির্মল আনন্দ দেবার জন্যই তিনি হাস্যরসের কাহিনী ফেঁদেছেন। অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানে এসব কবিতা লিখেছেন, কখনো স্মৃতিচারণা থেকে কাহিনীর প্রসঙ্গ টেনেছেন। কবিতাগুলোর গঠন কৌশলে ছন্দমিল ও শব্দ ব্যবহারের অপূর্ব দক্ষতা মনোহারিত্ব সৃষ্টি করে। ‘লিচু চোর’ কবিতাটি সুস্পষ্ট আখ্যানধর্মী শিশুতোষ কবিতা। কবিতার প্রথমেই দৃশ্য বর্ণনা আখ্যানের ভিত্তি রচনা করে-

বাবুদের ভাল-পুরুরে
হাবুদের ভাল-পুরুরে
সে কি বাস করলে তাড়া
বলি খাম একটু দাঁড়া”^{১১}

লিচু চোর লিচু গাছে উঠে মালির হাতে ধরা পড়লে যেমনটা হয়! গাছের আড়েই যে মালী লুকিয়ে ছিল তার ঘাড়েই সড়াং করে পড়েছে। কিন্তু মালিকে পরাস্ত করে, পাঁচিলের ফোকড় গলে বোসদের ঘরে গিয়ে রক্ষা। তৎক্ষণাৎ তৌবা করলেও পরের সপ্তাহ এলে শিশু মন কি ঘরে বসে থাকতে পারে? কবির কবিতায় সংলাপ নির্ভর করে শিশুদের

সাহিত্যিকী

সাথে গল্প করার কায়দা লুক্কায়িত আছে। জীবন-ঘনিষ্ঠ কিছু উপাদান ব্যবহার করে, কল্পনানির্ভর শব্দে শিশুমনকে উদ্দীপিত করেন কবি। “ঠ্যাং-ফুলী”তেও হাস্যরস,-নির্ভর অর্থহীন কিছু শব্দ দিয়েই আখ্যান রচনার ক্ষেত্র তৈরী হয়-

হো-হো-হো-উররো হো-হো!

... ... উররো হো-হো

বাস কি মজা!

... ...

হে বাবা! ঠ্যাং-ফুলো যে

হাসে জোর ব্যাংগলো সে

ড্যাং তুলে তার

ঠ্যাংটি দেখে ^{১১}

অর্থহীন শব্দই যেন কাহিনীর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে বিস্তৃত শেষাবধি বিষয়হীন মনে হয় সবকিছু। কিন্তু দসি়াপনা শিশুচিন্তে আনন্দের সঞ্চয় করে। “খোকার বুদ্ধি”, ‘খোকার গপ্পো বলা’ এসব কবিতায় কাহিনীর পরিসরে মা ও ছেলের কৌতুককর ঘটনার মধ্যে দিয়ে শিশুর বয়সের একটা সময়কে ধরার চেষ্টা আছে। শৈশব ও কৈশোরের মাঝে বালকসুলভ চপলতা, বুদ্ধির বিকাশ-এমন পর্বে কবি দুরন্তপনার ছবিতে বাঙালির চিরন্তন ঐতিহ্যের প্রচ্ছদ রচনা করেন এসব কবিতায়। বাঙালি সমাজের দৈনন্দিন জীবনগ্রহের ব্যাপকতা এখানে অনুমান করা যায়। এ পর্বে নজরুল হিন্দু-মুসলিম কোন জাতিত্বের দিকে দেখেননি, উভয় ধর্মের সম্মেলনে, সবকিছুর উর্ধ্বে বাঙালিয়ানার সূত্রকে ধরতে চেয়েছেন। ‘ন্যাংটা শ্রীযুত খোকন’, ‘গোঁদলপাড়ার জুজুরুড়ির পারা’, ‘জটায়ু পক্ষী’ ইত্যাদি শব্দে কৌতুককর আখ্যান রচিত হয় শিশুতোষ কবিতায়। দৃশ্যত লোক-উপাদানও মেলে কবিতাগুলোতে।

আখ্যানমূলক কবিতা আলোচনার পর্বে মূর্ত ও বিমূর্ত কাহিনীর কিছু কবিতা আমাদের বিশ্লেষণে এসেছে। অনেক কবিতায় কাহিনীর আভাস আছে মাত্র, আবার কিছু কবিতায় সুস্পষ্ট কাহিনীর বিধৃত্যন আছে। তবে এটা সত্য, নজরুল কাব্যে আখ্যায়িকা নেই। একমাত্র ‘মরু-ভাস্কর’ (১৯৫০) ছাড়া। ধর্মীয় চেতনামূলক কবিতায় আখ্যানের যতটুকু আভাস পাওয়া গেছে, সেখানে শিল্প মাত্রার চেয়ে সামাজিক দায়িত্বই তার বড়ো হয়ে উঠেছে। মুসলিম সমাজের জাগরণ চেয়েছিলেন নজরুল, হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলমানদের ঐতিহ্য চেতনার প্রতি সজাগ ও সচেতন দৃষ্টি লেপন করতে চেয়েছিলেন। সেজন্যই আখ্যানের আভাসে বারবার তার কবিতায় উচ্চকিত হয়েছে মুসলিম পুরাণ,। কগরবালা, ফোরাতে, সাত-ইল-আরব ইত্যাদির ছায়াচিত্রে। কখনো কবি কামাল পাশা, আনোয়ার, জগলুল, এদের বীরত্বগাঁথা প্রচার করেছেন। এছাড়া মুসলমানদের প্রিয়নবী মোহাম্মদ, মোহররমের কীর্তি গাঁথা নিয়েও আখ্যান ধর্মী কবিতা লিখেছেন। নিশ্চয়ই কোন

নজরুলের আখ্যানমূলক কবিতা

সম্প্রদায়ের প্রতি একচ্ছন্দীতা এর কারণ নয়। এসব কবিতা রচনার উদ্দেশ্যে সম্পর্কে এটা স্পষ্ট করে বলা যায়- নজরুল একদিকে মুসলমানদের যেমন জাগাতে চেয়েছেন তেমনি হিন্দুদেরও মুসলিম-ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিতি করিয়েছেন। সম্বোধিত স্বরে যে শাত-ইল-আরব কিংবা ফোরাৎ বা জগলুলকে ডাকছেন তার কারণ এদের কাহিনী-কিংবদন্তীকে প্রচার করা। তাদের কীর্তিগাঁথা দিয়ে, জয়ধ্বনি দিয়ে চর্চিত ইতিহাসের পুনর্মূল্যায়ন করা। বিশেষতঃ মুসলিমদের জন্যই তিনি এটা করেছিলেন। পশ্চাৎপদ, সংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিম সমাজকে স্বাধীনতার আন্দোলনে শরীক করবার জন্য, হিন্দুদের পাশাপাশি তারাও যেন নিজস্ব কিংবদন্তীতে বলীয়ান হয়ে সোচ্চার হতে পারে এটাই মূল উদ্দেশ্য। বাঙালি ভূখণ্ডে হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলমানদেরও যে গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য আছে সে সম্পর্কে সর্বধর্মের মানুষকে বৃহত্তর পরিমন্ডলে জানান দিতে চেয়েছেন কবি। এর মধ্য দিয়ে একদিকে মুসলমানদের জন্য যেমন সঞ্জীবনী মন্ত্রনার কাজ করেছে তেমনি অন্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও জাগিয়েছে আত্মীয়তার বোধ। যেটা বোধ করি স্বাধীনতার আন্দোলনকে প্রভূত প্রাণশক্তি দান করেছিল। নজরুলের আখ্যানমূলক কবিতাগুলো এমন চেতনা থেকেই গুরুত্ববহ।

পাদটীকা

১. নজরুল রচনাবলী (১ম খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৬, পৃঃ ৩৫।
২. নজরুল রচনাবলী (১ম খণ্ড), ঐ, পৃঃ ৪০।
৩. রফিউল ইসলাম, 'বাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও সৃষ্টি', কেপি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, বনরকাতা ২য় সংস্করণ, ১৯৯৭, পৃঃ ২৭৩।
৪. নজরুল রচনাবলী (১ম খণ্ড) প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৪৩৬।
৫. নজরুল রচনাবলী (১ম খণ্ড), প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ২৮।
৬. নজরুল রচনাবলী (১ম খণ্ড), প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ২৮।
৭. নজরুল রচনাবলী (১ম খণ্ড), প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৪৬২।
৮. নজরুল রচনাবলী (১ম খণ্ড), প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৯৪।
৯. নজরুল রচনাবলী (১ম খণ্ড), প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৫৪৯-৫৫০।
১০. নজরুল রচনাবলী (১ম খণ্ড), প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ১০।
১১. নজরুল রচনাবলী (১ম খণ্ড), প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৪৮৬।
১২. নজরুল রচনাবলী (১ম খণ্ড), প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৩৪১।
১৩. নজরুল রচনাবলী (১ম খণ্ড), প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৪৯২।
১৪. নজরুল রচনাবলী (১ম খণ্ড), প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ২৬৬।
১৫. নজরুল রচনাবলী (১ম খণ্ড), প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ২৬৯।